দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 06 JAN 2015
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

বছরজুড়েই প্রশ্নফাঁস শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন

উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে যা ছিলো টিআইবি রিপোর্টে

ফারুক হোসাইন

যে সুপারিশগুলো দিয়েছে তাও বাস্তবায়ন করেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সোনালী, অগ্রণী, জনতা, রূপালী ব্যাংকের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠনের সম্পৃক্ততার অভিযোগ উঠে। এসব প্রশ্নফাঁসের সঙ্গে ব্যাংকগুলোতে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালকদের মধ্যে সাবেক ছাত্র নেতা হিসেবে চিহ্নিতরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে এবার ব্যতিক্রম ছিল জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস ছিল না বলেই চলে। বিচ্ছিন্ন দু-একটি অভিযোগ থাকলেও অনেকটা শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয় এই পরীক্ষা। সরকারি নথিপত্র অনুযায়ী ১৯৭৯ সালে প্রথম এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়। ওই সময় থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত গত ৩৫ বছরে সরকারি-বেসরকারি তথ্য অনুযায়ী অন্তত ৮১ বার বিসিএসসহ বিভিন্ন চাকরি ও পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। এর মধ্যে পরীক্ষার স্থগিত, বাতিল ও তদন্ত কমিটি মাত্র ৩৪টি পরীক্ষার। তদন্ত কমিটি এর হোতাদের চিহ্নিত করে প্রশ্নফাঁস বন্ধে বিভিন্ন সুপারিশ করলেও কোনটিরও বাস্তবায়ন হয়নি। কারও শাস্তি নিশ্চিত করা হয়নি। তবে সময়ের আধুনিকতার সাথে সাথে প্রশ্নফাঁসেও এসেছে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার। চলতি বছর ভর্তি পরীক্ষাগুলোতে ব্লুটুথ ও ইলেকট্রিক ডিভাইসের মাধ্যমে ফাঁস করা হয় প্রশ্ন ও সরবরাহ করা হয় উত্তর। অন্যদিকে পাবলিক পরীক্ষাগুলোর প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে দেয়া হয় ফেসবুকের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে। বিশেষ সাজেশনের আকারে কিছু প্রশ্ন দেয়া হয়। এর মধ্যে কিছু কিছু প্রশ্ন চিহ্নিত করে দেয়া হয়। চিহ্নিত সেই প্রশ্নগুলোই মিলে যেতো পরীক্ষার মূল প্রশ্নপত্রের সাথে। এসব অপরাধ বিষয়ে আইন থাকলেও সরকার, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।

শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন : গেল বছর এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ছিল প্রায় ৯৩ ভাগ। আর জিপিএ-৫ পেয়েছে দেড় লাখের বেশি শিক্ষার্থী। আর এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৮৮ ভাগ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭০ হাজারের বেশি। তবে এদের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় পাস নম্বর উঠাতে ব্যর্থ হয়। সবচেয়ে অবাক করার মতো ঘটনা ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায়। এখানে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করে মাত্র দুই জন শিক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়া ইংরেজির শর্তারোপকৃত নম্বর ওই দুইজন ছাড়া আর কেউ পায়নি। অন্যদিকে 'খ' ইউনিটি থেকে পাস করে মাত্র ৯ ভাগ পরীক্ষার্থী। সব ইউনিট মিলিয়ে পাসের সংখ্যা ছিল ১৯ ভাগ। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর জিপিএ-৫ এর ছড়াছড়ি নিয়ে যখন উচ্চ শিক্ষার প্রবেশে পাস নম্বর উঠাতে ব্যর্থ তখন প্রশ্ন উঠে সামগ্রিক শিক্ষার মান নিয়ে। শিক্ষাবিদরা বলেন, জিপিএ-৫ নামে দেশে মাকাল ফল তৈরি হচ্ছে। সুজনের এক আলোচনা সভায় শিক্ষাবিদরা বলেন, বহির্বিশ্বকে শিক্ষার সাফল্য দেখাতে গণহারে পাস ও জিপিএ-৫ বাড়ানো হচ্ছে। এতে জাতি হিসেবে আমাদের কর্তৃত্ব নেই বলেও দাবি করেন তারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি ইউনিটের পাসের হার যাচাই করলে দেখা যায় তিন ইউনিটে মোট ৮৩ শতাংশ শিক্ষার্থীই অকৃতকার্য হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের এমন দৈন্যদশাকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মানকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে বলে মনে করছেন হয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন অনুমোদনের জন্য এক-তিন কোটি টাকা লেনদেন হয়। ডিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার নিয়োগ অনুমোদনের জন্য লেনদেন হয় ৫০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা। একটি বিশ্ববিদ্যালয় ৩০০ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে জনপ্রতি ৩ লাখ টাকার বিনিময়ে সনদ দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সংক্রান্ত পরিদর্শনের জন্য ৫০ থেকে ১ লাখ টাকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যে কোনো অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য ১০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা, অনুষদ অনুমোদনের জন্য ১০ থেকে ৩০ হাজার টাকা, বিভাগ অনুমোদনের জন্য ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা, পাঠ্যক্রম অনুমোদনের জন্য ৫-১০ হাজার টাকা, ভুয়া সার্টিফিকেটের জন্য ৫০ হাজার থেকে ৩ লাখ টাকা, নিরীক্ষা করার জন্য ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা লেনদেন এবং অ্যাসাইনম্যান্ট বাবদ ৫০০ টাকা ঘুষ নেয়া হয়। এছাড়া শিক্ষার্থীদের পাস করিয়ে দেয়া ও নম্বর বাড়িয়ে দেয়ার জন্য উপহার ছাড়াও নগদ অর্থের লেনদেন হয় বলে টিআইবির প্রতিবেদনে দাবি করা হয়। এছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমঝোতার মাধ্যমে নিজস্ব অন্যান্য ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবহার, ইউজিসিকে না জানিয়ে সাধারণ তহবিলের টাকা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার, বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ভুয়া কাগজপত্র ও স্বাক্ষর জাল করে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ ও আত্মসাৎ, শিক্ষকদের পারফরমেন্স মূল্যায়নে প্রভাব বিস্তার, কম যোগ্য ব্যক্তিকে বিভাগীয় প্রধান করাসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা বলা হয়। ক্লাস না করিয়ে, পরীক্ষা না নিয়ে ও ব্যবহারিক ক্লাস (বিশেষায়িত ল্যাব সুবিধা অপর্যাপ্ত) না নিয়ে টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট প্রদানের তথ্য দেয়া হয়। টিআইবি রিপোর্টটি প্রকাশ করার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি পৃথক দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করে।

শিক্ষার অর্জন : ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতায় ক্ষত লাগে শিক্ষাঙ্গনে। গত বছর ৩২ জেলায় ৪১৯টি প্রাথমিক, ৮২টি মাধ্যমিক, ২১টি মাদ্রাসা এবং ৯টি কলেজসহ মোট ৫৩৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ হয়। এতে বই-খাতা, চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চ, চক-ডাস্টার, শিক্ষা উপকরণ, কম্পিউটার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে হোঁচট দিয়ে বছর শুরু হলেও সামলে নেয় সরকার। প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ফিরিয়ে আনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আগের অবয়ব। তাছাড়াও গেল বছর দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঠ্যবইয়ের ৬০-৭৫ ভাগ শেষ করেই বার্ষিক পরীক্ষা নিতে হয়। এবার সেই পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাস কাভার করতে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের। এর মধ্যে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল নতুন বছরের শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেয়। টানা অবরোধ, হরতালকে পাশ কাটিয়ে প্রায় ২৬ কোটি বই বিতরণ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের এই সফল কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানান প্রধানমন্ত্রীসহ দেশের শিক্ষাবিদরা। রাজনৈতিক অস্থিরতার মাঝে যথাসময়ে সকল পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে পেরেছে শিক্ষা ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। অনেকটা প্রশ্নফাঁস ছাড়া শেষ হয় জেএসসি পরীক্ষা। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নির্দিষ্ট তারিখে বই বিতরণ, ক্লাস-পরীক্ষা শুরু করে সিলেবাস শেষ করে পরীক্ষা নেয়াটা ছিল সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ। এই কঠিন কাজটি আমরা করতে পারাটাকে সফল হিসেবে দেখতে চাই। এটা সরকারেরই প্রচেষ্টার ফল। তবে শিক্ষার আইন, উচ্চশিক্ষা কমিশনসহ কয়েকটি আইন করতে না পারার বেদনায় ছিল মন্ত্রণালয়ে।